# খানা-অভ্যন্তরে নারীর কৃষিকর্মে অংশগ্রহণ ও বীজ সংরক্ষণ

মুক্তি মণ্ডল

## ভূমিকা

পাশ্চাত্যের আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বাংলাদেশকে চেনে দরিদ্র-জনবহুল ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ-কবলিত রাষ্ট্র হিসেবে। এরা আমাদের অবিকশিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানুষের জন্য নানা ছুঁতোয় সহায়তা দিয়ে থাকেন, এ ধরনের সহায়তা প্রকল্পে এদেশের মানুষের ভাগ্য ও গণতন্ত্র বিকশিত হচ্ছে! মানুষের নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে স্বজাতির সামাজিক পরিসরে, যেখানে স্বজাতির মানসগঠনের প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হয়। এ প্রক্রিয়া সরল নয়, বর্ণিল ও বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক জীবনযাপনও এর অংশ। বাংলাদেশের কৃষক জনগোষ্ঠীর জীবনদৃষ্টিও ওইরকম বর্ণিল ও বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক বলয়ের ভেতর বিকশিত হচ্ছে। তাদের মানবজীবনও নগরের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করার চেষ্টা করছে, গ্রহণ করছে নগরের সাংস্কৃতিক দান, যেখানে নগরের মানুষের শিল্পকলা ও ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়। এই শিল্পকলা ও ক্ষমতা প্রদর্শনের গর্ভে আমাদের আধুনিক নগরসমাজ গড়ে উঠছে। সুশীলসমাজের সদস্যরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক বলয়ের ভেতর প্রান্তের মানুষের জীবনশৈলী প্রদর্শন করে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক নির্মাণে নিজেদের আলাদা চরিত্র গঠন করছে। এরকম চরিত্র ও জীবনভুবন আমাদের কৃষকসমাজে নেই। প্রান্তের মানুষেরা আধা-সামন্ত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত নাগরিক পরিধির দিকে এগিয়ে আসছে। এই পরিধি সুশীলদের সাংস্কৃতিক চেহারা ও গড়ন-বৈশিষ্ট্য দ্বারা বেষ্টিত। এই বেষ্টনের বাইরে কৃষকসমাজভুক্ত মানুষেরা নিজেদের জীবনপ্রণালি বদলিয়ে ফেলছে। এরা নিজেদের নাগালের মধ্যে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তির দানসমূহ গ্রহণ করছে ধীরে ধীরে। খোলাদৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে অনুভব করা যায় যে, বর্তমানেও এখানকার অধিকসংখ্যক জনগোষ্ঠী কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষির আঙিনাকে ক্রমাগত প্রসারিত করছে আধুনিক প্রযুক্তির মুক্ত প্রবাহ। তারপরও কৃষি-অকৃষিখাতে দিনমজুরির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন এমন জনগোষ্ঠীও অনেক, এদের জীবন সুশীলজীবন থেকে ভিন্নতর। একদম আলাদা। এদের দরবেশ আছে, বটগাছের মতোন এদের জীবন স্থির নয়, ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে এসব জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনে। এদের জীবনযাপন পর্যবেক্ষণ করলে অনুধাবন করা যায় যে, তাদের যাপনশৈলীতে তাদেরই নিজস্ব সাংস্কৃতিক বোধ প্রকাশিত হয়, এই বোধের গতিধারায় পরিবর্তন আসছে। এ জনগোষ্ঠীর বাস গ্রামীণ এলাকায়। প্রান্তস্থিত এসব মানুষ বাংলাদেশের কৃষিকেন্দ্রিক সামন্ত-অর্থনৈতিক বলয় থেকে বিচ্যুত নতুনভাবে গড়ে ওঠা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর নির্মিত 'সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক' পরিমণ্ডলে 'অতিদরিদ্র', 'এনজিওঅভীষ্ঠ', 'সুবিধাভোগী'— এ ধরনের নানা অভিধায় পরিচিত, যে পরিচিতকরণে মিডিয়া দূত হিসেবে কাজ করছে। যারা বাংলাদেশের আনাচেকানাচে নানা কারণে ঘুরে বেড়ান, তাদের কাছে উক্ত অভিধা বর্গীবাক্য ছাড়া আর কিছু নয়।

## লেখা তৈরির পদ্ধতি ও কৃষকসমাজ বিষয়ে কিছু কথা

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই সহজ সরল ও অল্পে তুষ্ট। এই অধিকাংশ মানুষের বাস কৃষকসমাজে। এখানে কৃষকসমাজ বলতে আমরা বুঝব সেসব পরিবার বা খানাকে, যারা কৃষির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, যাদের পরিবারের মূলশক্তি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। উক্ত পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা কৃষিকে কেন্দ্র করেই টিকে থাকছে। আমার এই মনোভাব পোক্ত হয়ে উঠেছে গত দশ মাসে (আগস্ট ২০১০ থেকে মে ২০১১) নোয়াখালী. লক্ষীপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী ও ভোলা জেলার কয়েকটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের কৃষিকাজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী, যেমন ক্ষুদ্র কৃষক, মাঝারি কৃষক, বড়ো কৃষক ও ভূমিহীন কৃষকসহ পণ্য বাজারজাতকরণের সাথে সরাসরি জড়িত ফড়িয়া, পাইকার, আড়তদার ও মোকাম ব্যবসায়ী এবং উপকরণ ব্যবসার সাথে জড়িত ডিলার, সাব ডিলার, খুচরা উপকরণ বিক্রেতা প্রমুখের সাথে আলাপ ও আড্ডার মাধ্যমে। গত দশ মাসে এসব পেশাজীবীর সাথে আলাপ ও আড্ডা-অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই এ লেখাটা দাঁড় করানো হয়েছে। সে অর্থে এ লেখাটা কোনো গবেষণাকর্ম নয়, গবেষণাকর্মের প্রস্তুতিও এর ভেতরে নেই। বড়োজোর কৃষকসমাজকে পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতার খেরোখাতায় টুকে রাখা টুকরো কথনের খসড়া হিসেবেই দেখতে চাই এ লেখাটাকে। এখানে আমি নিজস্ব অভিজ্ঞতার ছাঁকনি ব্যবহার করেছি। মিডিয়া যে সত্য উৎপাদন করে নগরে, তার বাইরে কৃষকসমাজের যেসব মানুষ শিরদাঁড়া খাড়া করে জীবনযাপন করতে চায়, তাদের জীবনশৈলী কৃষি উৎপাদনভিত্তিক; এরা প্রতিনিয়ত কৃষিপ্রযুক্তিকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে ধাবিত হচ্ছে। গত ১০ বৎসর যাবৎ আমি বাংলাদেশের বহু গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেড়িয়ে এই ধরনের সত্য টের পেয়েছি। এই সত্যের বালুকণা হয়ে উঠেছে আমার অভিজ্ঞতা। আমি বিভিন্ন পেশার মানুষের সাথে কথা বলেছি; হাটে-বাজারে, চায়ের দোকানে, বাড়িতে বসে আড্ডা দিয়েছি। অনেকের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে। গ্রামের মানুষের সাথে ভালোভাবে না-মিশলে, বন্ধুত্ব না-করতে পারলে, তাদের ভালোভাবে জানাবোঝা সম্ভব নয়; বিভিন্ন সময়ে গবেষণা কাজে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমার ভেতর এই ধারণা জন্মেছে। তাছাড়া আমার জন্ম একদম গ্রামে। বেড়ে উঠেছিও গ্রামে। সে কারণে, আমার

অভিজ্ঞতার ভিতর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, গ্রামীণ এলাকার কোন ধরনের জনগোষ্ঠী এদের কার্যক্রমের সাথে জড়িত, সে বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা আছে। সে ধারণা আমি আমার এ লেখায় তথ্য হিসেবে কাজে লাগিয়েছি। যখন আমি মানুষের সাথে মিশেছি, তখন চোখ-কান খোলা রেখেছি। গ্রামের[১] মানুষের সাথে গভীরভাবে মেশার চেষ্টা করেছি। এর ভেতর দিয়ে তাদের কাজকর্ম, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে তাদের ভাবনা-চিন্তা বোঝার চেষ্টা করেছি। নারীকে পুরুষরা কীভাবে দেখে, পুরুষদের 'নারী' সম্পর্কে কেমন ধারণা, ঘরে ও ঘরের বাইরে তাদের সাথে সম্পর্ক কীরকম, তা-ও অবলোকন করার চেষ্টা করেছি।

## কৃষিকর্মে নারীর সম্পৃক্ততা

আর একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, আমি এ লেখায় পরিবার[২] বা খানা বা ঘরকে সমার্থক হিসেবে দেখব। যেসব এলাকার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ওইসব এলাকায় নারীরা পরিবারের বাইরে সাধারণত শ্রম বিক্রি করার জন্য বের হন না, যেমন দিনাজপুরে অনেক দিনমজুর নারী আছেন। তাঁরা নিজেদের জীবন নিজেদের অর্জিত অর্থ দিয়ে পরিচালনা করেন। তাদের বেঁচে থাকা কারো ভরসার ওপর বা বলা যায় পুরুষের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে না। কিন্তু বৃহত্তর বরিশাল এলাকায় এরকম দৃশ্য দেখা যায় না। আঙিনার ভেতরে যদিও তারা এরকম কাজ করেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তারাও জড়িত। কিন্তু তারা যেসব কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেন, তা কৃষকসমাজে ও রাষ্ট্রের নীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে স্বীকৃত হয় না। গৃহস্থকাজ গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডভুক্ত হিসেবে বিবেচনায় রেখে নারীদের কর্ম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, গ্রামীণ নারীদের জীবনপ্রণালি কৃষির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, কৃষি কর্মকাণ্ডে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আছে ও তা নিজেদের জীবন বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত। আর এ চিহ্নের উজ্জ্বলতা কৃষিকে অবলম্বন করেই আরো উজ্জ্বলতর রূপ ধারণ করছে। এসব এলাকার অনেক নারী বাড়ির বাইরে বের হওয়ার সময় সাধারণত বোরকা পরে বের হন। বোরকাহীনও আছেন, তবে তাদের সংখ্যা কম। এ এলাকার নারীরা কৃষকসমাজের গড়নের মধ্যে থেকেই প্রাত্যহিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন। তাদের বেঁচে থাকার ধরন নগরসমাজের নারীর মতো নয়। কায়িক শ্রমকে ব্যবহার করেই এই নারীকুল টিকে থাকার জন্য ক্রমাগত লড়াই করে যাচ্ছেন। ব্যতিক্রমও আছে। পর্যবেক্ষণকৃত এলাকার অধিকাংশ নারীই পুরোমাত্রায় গৃহস্থকাজ করেন। বাড়ির আঙিনায় শাকসবজি চাষসহ হাঁস-মুরগি পালনও তারা করেন। বিভিন্ন ফসল ওঠার সময়ে গ্রামীণ নারীদের কাজের পরিধি বহুগুণে বেড়ে যায়। এ সমস্ত কাজের ভেতর শস্য পরিষ্কারকরণ, বাছাইকরণ ও বীজ সংরক্ষণ অন্যতম।

## কৃষিতে পরিবর্তন ও নারীর কর্মপরিধি

গত দুই দশকে বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থায় বিবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষকসমাজে নারীদের কাজের পরিধিও অনেক পরিমাণে বেড়েছে, কিন্তু তাদের জীবনমান সে তুলনায় উন্নত হয় নি। আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তির ব্যবহারসহ বীজ উৎপাদনেও ব্যাপক রদবদল ঘটেছে। এর মধ্যে কৃষিতে উচ্চ ফলনশীল বীজের প্রবেশ ঘটেছে দেশীয় কৃষিবিজ্ঞানীদের দৌলতে। এর ফলে কৃষি ও কৃষকের উৎপাদন কৌশলেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। যে কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করে সকল নাগরিকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যোগান দিলেও বাজার ব্যবস্থাপনায় তাদের কোনো মতামত বা ভূমিকা নেই। পণ্য উৎপাদক হিসেবে তা থাকা প্রয়োজন। তাহলে তাদের পণ্য বিক্রি করার স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটত। সামন্ত দশা থেকে উদ্ভূত আমাদের দেশের নব্য বণিকেরা ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়ান, কিন্তু কৃষকরা ইচ্ছেমাফিক তাদের পণ্যের দাম বাড়াতে পারেন না। এখানেও বণিকরাই পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেন। কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বহুস্তর পার হয়ে ভোক্তার কাছে এসে হাজির হয়। এসব স্তরে কৃষকের কোনো অংশগ্রহণ নেই। উৎপাদক হিসেবে তার পণ্য কত দামে বিক্রি করবেন তা তারা নিজেরা স্থির করতে পারেন না। দাম নির্ধারণের জন্য তাদের কোনো সংগঠন নেই, সংঘ নেই। সামগ্রিক কোনো তৎপরতাও নেই। এখানে যারা পণ্য ক্রয় করেন, তাদের ভূমিকাই প্রধান। উক্ত একরৈখিক বণিকশ্রেণির বাজার ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত দক্ষতা ও ক্ষমতার পরিসরের প্রথম ধাপে কৃষকরা অসংগঠিতভাবে বাজারব্যবস্থাপনার বাইরে অবস্থান করছেন।

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, কৃষকরা সাধারণত নিজেদের ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করেন পরবর্তী সময়ে ফসল বোনার জন্য। এ পদ্ধতি বহু পুরানো। বংশপরম্পরায় এ পদ্ধতি চলে আসছে। আর এ পুরানো পদ্ধতির মূলে নারীর ভূমিকাই প্রধান। বীজ রাখার সমস্ত দায়িত্বই নারীর হাতে রক্ষিত হয়ে আসছে গ্রামীণ এলাকায়। নারীরাই বীজ রাখার সকল প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকেন। এটা কৃষকসমাজে অনেকটা রীতির মতো। পুরুষ মাঠ থেকে ফসল বাড়ির আঙিনায় আনার পর নারীর হাতেই তা মাড়াই হয়, নারীরাই বীজ সংরক্ষণ করেন। যেসব নারী শ্রম দেবার জন্য বাড়ির বাইরে যান না, তারাই বীজ রাখার প্রায় সমস্ত কাজ করে থাকেন বাড়ির আঙিনার মধ্যে। এ কাজের কোনো স্বীকৃতি রাষ্ট্র বা সমাজ নারীকে দেয় না। কিন্তু তারা এ কঠিন কাজটা করেন। এই রীতির ভাঙনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যতই হাইব্রিড বীজের প্রসার ঘটছে, নারীর বীজ সংরক্ষণের ভার ততই কোম্পানির হাতে চলে যাচ্ছে। কৃষকরা যতই বাজারমুখী উৎপাদনের দিকে

ঝুঁকছেনম ততই তাদের হাইব্রিড বীজ ক্রয় করবার জন্য ঝুঁকতে হচ্ছে কোম্পানির ডিলার বা সাব ডিলার অথবা খুচরা বিক্রেতার কাছে। এসব বীজের প্যাকেটে নারীর অবদানের কথা লেখা নেই, কিন্তু কোম্পানির নাম লেখা আছে। হাইব্রিড বীজ যারা ব্যবহার করছেন, তাদের উৎপাদন বাড়ছে, আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটছে; কিন্তু তাদের পুরানো পদ্ধতি আর টিকতে পারছে না। কারণ, এতে উৎপাদন বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু বীজ তাকে প্রতিবারই ক্রয় করতে হচ্ছে কোম্পানির নিয়োজিত বণিককুলের কাছ থেকে। কৃষকরা দেশীয় বীজের উৎপাদনের চেয়ে অধিক উৎপাদন করছেন এটা ঠিক। কিন্তু এ বীজ সংরক্ষণ করা যায় না, যে কারণে নারীদের বীজ সংরক্ষণ কর্মকাণ্ড সংকুচিত হচ্ছে, বীজের ভার কোম্পানির হাতে চলে যাচ্ছে।

আমার পরিভ্রমণকৃত কৃষকসমাজে পরিবার-অভ্যন্তরে নারীরা অধস্তন অবস্থায় দিনযাপন করেন। পরিবারে নারীরা অনেক অসমতার[৩] ভেতর জীবনধারণ করে টিকে থাকেন, কোনোরকমে বেঁচে থাকার লড়াই করেন। তারপরও তারা যে গৃহস্থকাজগুলো সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন, তার কোনো স্বীকৃতি তারা পান না। বীজ সংরক্ষণ কর্মকাণ্ডকে তারই একটি নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।

## সয়াবিন চাষি পরিবারে নারী

নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলায় সবচেয়ে বেশি সয়াবিন উৎপাদিত হয়। আমি লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলার কয়েকটি গ্রামে লক্ষ করেছি যে সয়াবিন চাষের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা অনেক। সয়াবিন এ এলাকার মানুষের অর্থকরী ফসল। উৎপাদন খরচ খুব কম, কিন্তু লাভ অনেক বেশি। এ এলাকার কৃষকরা সোহাগ নামের বীজ ব্যবহার করেন। সয়াবিন ফসল ঘরের আঙিনায় আসার পরপরই নারীর কাজের চাপ অত্যধিক বেড়ে যায়। তারা সয়াবিন শুকানো, পরিষ্কারকরণ, ঘরে সংরক্ষণ এবং বাছাইকরণের কাজগুলো করে থাকেন। সয়াবিন চাষি পরিবারের প্রায় ৬০ শতাংশ নারী ও ৪০ শতাংশ শিশু সয়াবিন ওঠার পর উল্লিখিত কাজগুলো করেন। এছাড়া নারীরা বীজ শুকানো, পরিষ্কার করা ও প্লাস্টিকের ব্যাগে শুকানো বীজ সংরক্ষণ করেন। এ কাজ সয়াবিন চাষি পরিচারের শতভাগ নারীই করেন। সয়াবিন সংরক্ষণের পর উক্ত বীজ মাঝে মাঝে রোদে শুকানোর কাজও নারীকুলই করেন। পরবর্তী সময়ে যখন বীজ বপনের কাল আসে, তখন তারা সংরক্ষিত বীজ দিয়ে বাড়ির আঙিনায় বীজতলা তৈরির কাজ করেন। বীজ বপনের আগে ট্রায়াল দেয়ার কাজ এটা। আগে আঙিনার বীজতলায় বীজ বপন করে পরীক্ষা করে দেখা হয় কতভাগ বীজ ফুটেছে। যদি ৮০ থেকে ৯০ ভাগ বীজ ফোটে, তাহলেই সেই বীজ মাঠে বপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ কাজেও নারীর ভূমিকাই প্রধান। সয়াবিনের বীজ উচ্চ ফলনশীল। সয়াবিনের হাইব্রিড বীজ এখনো বাজারে আসে নি, যেজন্য এ ফসলের বীজ সংরক্ষণের ভার ষোলআনাই এখনো নারীর হাতে আছে।

## মুগডাল উৎপাদনকারী কৃষি পরিবারে নারী

ভোলা জেলার চরফ্যাশন, মনপুরা এবং পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার মুগডাল চাষিদের সাথেও আমি আলাপ করেছি, আড্ডা দিয়েছি। ওইসব এলাকার উপকরণ বিক্রেতা ও সব ধরনের মুগডাল ব্যবসায়ীর সাথেও কথা বলেছি। বিশেষ করে চাষিদের সাথে বেশি পরিমাণ সময় কাটিয়েছি। আলাপে ও আড্ডায় চাষিদের কৃষিকর্ম বিষয়ে অনেক তথ্য উঠে এসেছে। তাদের দেয়া তথ্যানুযায়ী, ক্ষুদ্র মুগডাল চাষি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৯৫ ভাগ নারী মুগডাল উৎপাদনসংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে মাঝারি মুগডাল চাষি পরিবারের প্রায় ৪৪ ভাগ নারী মুগডাল উৎপাদন কাজে অংশ নেন। মুগডাল ওঠার সময়কার কাজে নারীদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি। এসময় নারীদের প্রায় ৮০ ভাগ এ কাজে যুক্ত হন, যেখানে পুরুষদের অংশগ্রহণ মাত্র ২০ ভাগ। এক্ষেত্রে নারীরা যেসব কাজ করেন তা হলো : মুগডাল রোদে শুকানো, পরিষ্কার করা. ভালো ও মন্দ মুগ বাছাই করা এবং বীজ সংরক্ষণ করা। বীজ সংরক্ষণের পুরো কাজই তাদের। বারি মুগ জাত ৫ ও ৬ কৃষকরা আবাদ করছেন। এর ফলে তাদের উৎপাদনও আগের যেকোনো সময়ের থেকে বেড়েছে। মুগডালের কোনো হাইব্রিড বীজ এখনো বাজারে আসে নি। কাজেই মুগডালের বীজ সংরক্ষণের ভার এখনো কৃষক নারীর হাতে।

## মরিচ চাষে নারীর অংশগ্রহণ

ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার দুটি গ্রামে এবং বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার একটা গ্রামের মরিচ চাষিদের সাথেও আমি কথা বলেছি। এখানেও কৃষক পরিবারের নারীরা মরিচ বীজ সংরক্ষণ করেন। পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে যে নারীদের প্রায় ৮১ ভাগ বীজ সংরক্ষণের কাজ করেন, ১৫ ভাগ নারী মরিচ বাছাইয়ের কাজ করেন এবং প্রায় ৩০ ভাগ নারী মরিচ রোদে শুকানোর কাজ করেন। লক্ষ করা গেছে, চরফ্যাশনে আস্তে আস্তে দেশি মরিচের জায়গায় হাইব্রিড মরিচ ঢুকছে। হাইব্রিড মরিচ দেশি মরিচের জায়গা দখল করা মানে নারীর মরিচবীজ সংরক্ষণের কাজ কমে যাওয়া, যে প্রক্রিয়ায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বীজের বাজার দখল করে নেবে। এখনি প্রায় ২০ ভাগ মরিচবীজের বাজার কোম্পানির দখলে চলে গেছে। বর্তমানে হাইব্রিড বীজ ব্যবহারকারীরা শুধু কাঁচামরিচ চাষ করছেন। এলাকায় কাঁচামরিচের ব্যবহারও আগের তুলনায় বাড়তির দিকে। এই হাইব্রিড কাঁচামরিচের চাষ শুকনো মরিচ চাষের থেকে কয়েকগুণ বেশি লাভজনক। কিন্তু সার, কীটনাশক ও আধুনিক প্রযুক্তির

ব্যবহার এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। উৎপাদনও দেশি মরিচের তুলনায় অনেক বেশি, ফলে লাভও বেশি। এতে বীজ সংরক্ষণের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। নারীদের কাঁধে বীজ সংরক্ষণের ভার থাকে না। এ দায়িত্ব চলে যাচ্ছে কোম্পানির হাতে। হাইব্রিড বীজ ব্যবহারে লাভ বেশি বলে চাষিরা আস্তে আস্তে সেদিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এটা খারাপ-না-ভালো, সে বিতর্কে যাব না। নারীরা যে কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করছে সুদূর অতীত থেকে, সে কাজের স্বীকৃতি নেই রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে। এ কারণে তাদের শ্রম মূল্যহীন হয়ে থাকছে, তাদের অধস্তনতাও থেকে যাচ্ছে। তাদের কৃষিকাজে অংশগ্রহণকে যতদিন স্বীকৃতি না-দেয়া হবে, ততদিন তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের পথ সুপথ না-হয়ে কুপথ হয়েই রয়ে যাবে। এদিকে নীতি-নির্ধারক ও রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। নারীরা বীজ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের পরিবারকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগান। বীজ সংরক্ষণের আধুনিক জ্ঞান প্রদান করতে পারলে এক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা আরো বাড়বে এবং বীজ সংরক্ষণে তারা আরো ভালোভাবে মনোনিবেশ করতে পারবেন। বীজ সংরক্ষণ কাজকে মূলধারার কাজের সাথে সংযুক্ত করে নিলে এ ক্ষেত্রটা লাভজনক কর্মক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

**মুক্তি মণ্ডল** কবি ও গবেষক। ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এন্টারপ্রাইজ-এ কর্মরত। mukte.mandal@gmail.com

---

[১] বার্টোসি (১৯৭০), ব-দ্বীপ অঞ্চলের ভূ-খণ্ডে আলাদাভাবে একটি গ্রামকে অভিহিত করা দুরূহ কাজ বলে অভিমত দিয়েছিলেন, এটা একজন বিদেশি গবেষকের কাছে মনে হতেই পারে। গ্রামকে অভিহিত করা কোনো দুরূহ কাজ নয়। বদ্বীপ ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে গভীর ধারণা থাকলে গ্রাম সম্পর্কে এ ধরনের অভিমত ধোপে টিকবে না। গ্রামবাসীর সাথে আলাপ আলোচনা করে আমার তাই মনে হয়েছে। গ্রামবাসীর সাথে কথা চালাচালির সময় আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাদের গ্রাম কোথা থেকে শুরু কোথায় শেষ। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তারা গ্রামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। গ্রামের কোনো কিছু বাদ দেন নি। প্রত্যেক পরিবারের বাড়ি, জমাজমি, লোকসংখ্যা, গ্রামের কোথায় কী কী প্রতিষ্ঠান আছে; যেমন মসজিদ, স্কুল, দোকান, পুকুর, কালভার্ট ইত্যাদি তথ্য নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। এসব তথ্য নিখুঁতভাবে তারা বলতে পেরেছেন এজন্য যে তারা আমাকে 'পর' মনে করেন নি। আমাকে তাদেরই একজন মনে করে বলেছেন। আশেপাশের পাড়া বা গ্রামের সীমানা কোথায় বা ওইসব পাড়া বা গ্রামের মানুষের জমির আইল বিষয়েও গ্রামের মানুষের সুস্পষ্ট ধারণা আছে।

[২] এখানে 'খানা' বা 'পরিবার' এই প্রত্যয়টির ইংরেজি Household-এর অর্থ কী তা বোঝার চেষ্টা করব। Oxford Dictionary of Sociology (2004)-এ Household বলতে যা বোঝানো হয়েছে, তা হলো : A group of persons sharing a home or living space, who aggregate and share their incomes, as evidenced by the fact that they regularly take meals together - the 'common cooking-pot' definition. Most households consist of one person living alone, a nuclear family, an extended family, or a group of unrelated people. The definition is sometimes varied so as to exclude, or include, households of non-related people who may set very variable limits, in practice, to the extent of their income-sharing or common expenditure. একেকজন গবেষক তাদের গবেষণায় 'খানা' বা 'পরিবার'-এর একেকরকম সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, এবং তার ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালনা করেছেন। এই 'খানা' বা 'পরিবার'-এর সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা কেউই প্রদান করেন নি। আমার এ লেখায় আমি উক্ত 'খানা' বা 'পরিবার'কে 'পরিবার' হিসেবে ব্যবহার করব। যেটাকে 'চুলা' হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। অনেকেই এই 'চুলা' নিয়ে গবেষণার কী আছে (আরেফিন, ১৯৯২) বলেও মন্তব্য করেছেন। আসলে এ ধরনের বিভ্রান্তিতে কান দেবার কোনো দরকার নেই। জহির (২০০৮) তাঁর প্রবন্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সেনসাসে হাউজহোল্ড-এর অফিসিয়াল যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা এখানে উল্লেখ করছি : A group of people who eat food prepared from the same cooking pot and live together. এই সংজ্ঞার সাথে অক্সফোর্ড ডিকশনারি অফ সোসিওলজির সংজ্ঞা কিছুটা মিলে যায়। জহির (২০০৮) কর্তৃক উদ্ধৃত বাংলাদেশ সার্ভে ১৯৭৫-'৭৬-এ হাউজহোল্ড-এর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে : A group of persons usually living together in a structure of dwelling. A household may also be found within a shop, office, and mosque or on a boat, in a tent as long its members sleep and eat there regularly. এখানে হাউজহোল্ড-এর সংজ্ঞায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, হাউজহোল্ড বসবাসের একটি জায়গা এবং সকল সদস্য একসাথে খায়। কিন্তু একই সাথে বসবাস করেও একসাথে না-ও খেতে পারে। আলাদা 'চুলা' হতে পারে। আলাদাভাবে রান্না করে খেতে পারে। সেক্ষেত্রে উক্ত সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা আছে। বিএইচইএস (১৯৭৫-৭৬;৫)-এ এভাবে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে : A household may be defined as a dwelling unit where a single person lives alone or a group of persons normally live and eat together from the common cooking arrangements. Persons living in the same dwelling unit but having meals from separate cooking arrangements will constitute separate households. এখানে হাউজহোল্ডের সদসরা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ও বসবাস করতে পারেন আবার একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে পৃথকভাবেও বসবাস করতে পারেন বলে উল্লিখিত হয়েছে। দুটো বিষয় এখানে উল্লেখ্য; একসাথে বসবাস এবং একসাথে খাওয়া-দাওয়া করা। সেই সাথে একই সাথে রান্নার বিষয়টিও যুক্ত। আমি আমার এ লেখায় এই হাউজহোল্ডকে 'পরিবার' হিসেবে অভিহিত করব তা আগেই উল্লেখ করেছি। তার আগে পরিবার নিয়ে পূর্ববতী গবেষকরা কী ধারণা পোষণ করেছেন তার উল্লেখ করতে চাই।

আরেফিন (১৯৮৬) পরিবার বলতে বুঝিয়েছেন, জ্ঞাত-গোষ্ঠী সম্পর্ক সংগঠন এবং এই পরিবার গ্রাম এলাকার মৌল উৎপাদন এককও। তিনি বলেছেন, 'পরিবার' বাংলা শব্দ যা বহুলার্থে ব্যবহৃত হয়। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এই শব্দটি 'স্ত্রী' অর্থে অথবা কোনো একটি পরিবারের সকল সদস্যকে একযোগে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত 'পরিবার' প্রত্যয়টি চুলা, ঘর, খানা (যারা একসঙ্গে খায়) এবং ঘর (আক্ষরিক অর্থে বাসা) ক্যাটাগরির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। তিনি ইসলাম (১৯৭৪)-এর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'এ বাংলাদেশ ভিলেজ : কনফ্লিক্ট অ্যান্ড কোহেসন' থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, গ্রামবাসীরা পরিবারসংখ্যাকে চুলা দ্বারা নির্ধারণ করে, কারণ একটি পরিবারের খাবার তৈরি হয় একটি চুলায়। তিনি আরো বলেন যে, ঘর (সংস্কৃত শব্দ 'গৃহ', যার অর্থ বসবাসের ঘর) শব্দটিও পরিবার বোঝাতে ব্যবহার হয় এবং এর দ্বারা বোঝানো হয় এমন কিছু লোককে যারা একসঙ্গে একটি গৃহে বসবাস করে। খানা শব্দটিও পরিবার বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। যার অর্থ একান্নবর্তী গোষ্ঠী। আমি আমার এ লেখায় 'পরিবার' বলতে বোঝাব একই চুলায় রান্না করে যারা খায় এবং একই সাথে যারা একই গৃহে বসবাস করে। ইসলাম (১৯৭৪) ঘর, বাড়ি এবং পরিবারের মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন। তাঁর মতে, ঘর, বাড়ি এবং পরিবার বলতে বোঝায় যথাক্রমে একক পরিবার, বর্ধিত পরিবার এবং স্থানীয় পিতৃগোষ্ঠী। আরেফিন (১৯৮৬) এই সংজ্ঞাকে বিভ্রান্তমূলক বলে মতপ্রকাশ করেছেন। তিনি ঘর এবং পরিবার শব্দ দুটি শিমুলিয়ায় সমার্থক এবং সাধারণত পরিবারকে বোঝাতেই ব্যবহৃত হয় বলে উল্লেখ করেছেন। আমার লেখায় আমি 'ঘর' 'খানা' বা 'পরিবার'কে সমার্থক হিসেবে দেখব।

[৩] পরিবার বা খানাকেন্দ্রিক গবেষণালব্ধ আকর অভিজ্ঞতা এবং তাত্ত্বিক কাজের প্রদর্শনের মাধ্যমে জানা গেছে যে, পরিসম্পদ বণ্টন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যমাত্রার অসমতা পরিলক্ষিত হয়েছে পরিবারের অভ্যন্তরে এবং এর বাইরে (সেন, ১৯৮৭)। সেন, সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, পরিবার বা খানাতে চমৎকারভাবেই 'সহযোগিতাপূর্ণ অমতৈক্যতা'র পরিসর বা 'কোঅপারেটিভ কনফ্লিক্ট'-এর পরিসর প্রদর্শিত হয়। এই পরিসরের মধ্যে দম্পতিদের বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য ও কৌশল বিদ্যমান থাকে, থাকে অনেক ধরনের সক্ষম সমাধানের উপায়সমগ্র, যেগুলোকে তিনি প্রত্যায়িত করেছেন 'collusive agreements' হিসেবে। সমাধানসমগ্র শেষ পর্যন্ত দম্পতির দেনদরবারের সক্ষমতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও দম্পতিরা ক্ষমতার সমটেবিলে বসে দেনদরবার করেন না (সেন, ১৯৮৭)। সেন আরো বলেছেন যে, একজন নির্ধারক বা সিদ্ধান্তকারী অভিমত প্রদানের ক্ষেত্রে যে বৈধতা পায় তার ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন, সে ব্যক্তি অধস্তন পর্যায়েরও হতে পারে। আগারওয়াল (১৯৯৪), সেনের এই বিষয়ের সাথে সহমত প্রকাশ করেছেন।